চিনিশিল্প ও আখচাষ:
গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতালদের ভূমি উদ্ধারের লড়াই

মোশাহিদা সুলতানা, নেসার আহমেদ, রাখাল রাহা

সারাদেশে একদিকে ব্যক্তি ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর হাতে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পদ হস্তান্তর চলছে নানা প্রক্রিয়ায়, অন্যদিকে দেশের সর্বজনের উন্মুক্ত স্থান-পাহাড়-বন, দুর্বল জনগোষ্ঠীর ভূমি দখল ও আত্মসাতের ঘটনা ঘটছে। ধর্মে ও জাতিতে সংখ্যালঘুদের জমির ওপর ক্ষমতাবানদের আগ্রাসন চলছে সরকার দলীয় লোকজন ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদদে। এই প্রবন্ধে গাইবান্ধায় রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিশিল্পের ভূমি ব্যক্তিগত খাতে দখলের নানা পর্ব অনুসন্ধানের পাশাপাশি সাঁওতালদের নিজেদের ভূমি উদ্ধার আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে দেশ ও দশের বিশেষত ভূমিবঞ্চিত উদ্বাস্তুদের স্বার্থরক্ষায় কী করণীয় সেবিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

১. ভূমিকা

গোবিন্দগঞ্জের ভূমি উদ্ধার আন্দোলনসহ জনগণের বিভিন্ন আন্দোলনে রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকারি দলের পেটোয়া বাহিনীর হিংস্রতা ও নির্মমতার শিকার সাধারণ মানুষগুলো একটি প্রশ্ন বারবার আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে, তা হলো–এই রাষ্ট্র কার স্বার্থ রক্ষা করে থাকে? অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রকৃতি বা চরিত্রের স্বরূপ কী? দুই বছরের অধিককাল ধরে নিজেদের পৈতৃক ভূমির অধিকার পেতে আন্দোলন করে আসছে ভূমিবঞ্চিত সাঁওতাল ও বাঙালিরা। কিন্তু সরকার তাদের দাবি বিবেচনার প্রয়োজন অনুভব করেনি। শান্তিপূর্ণ পথে না হেঁটে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক আমলের রাষ্ট্রের ন্যায় নৃশংস ও বর্বর পথ বেছে নেয়া হলো। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের মালিক জনগণ। আর এই মালিকদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালাল, বাড়িঘর পুড়িয়ে দিল, জিনিসপত্র লুটপাট করে নিল জনগণের দেয়া ট্যাক্সের অর্থে পালিত এবং ক্ষমতাসীনদের আদেশে চলা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও তথাকথিত রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের গুণ্ডাবাহিনী। এই প্রবন্ধে গাইবান্ধায় ভূমি উদ্ধার আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এর পাশাপাশি চিনিশিল্পের সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে চিনিশিল্প উন্নয়নে সাঁওতালদের ভূমি দখলের আদৌ প্রয়োজন আছে কি না, এবং ভূমিবঞ্চিত উদ্বাস্তুদের স্বার্থরক্ষায় কী করণীয় সেই দিকগুলোর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

এক পর্যায়ে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালানো শুরু করে। এ সময় কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হয়। আহতদের মধ্যে শ্যামল হেমব্রম বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেন। আর আখক্ষেত থেকে উদ্ধার করা হয় মঙ্গল মার্ডির মরদেহ। মারাত্মকভাবে জখম হন চরণ সরেণ, বিমল কিস্কু ও দ্বিজেন টুডু। দ্বিজেন টুডুর চোখে গুলি লাগে।

১.১ কী ঘটেছিল ৬ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে

৬ নভেম্বর সকালে বিনা নোটিশে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম এলাকার ইক্ষুখামারে সাঁওতাল ও বাঙালিদের বসতবাড়িতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে। সাধারণ মানুষ জানমাল রক্ষার্থে প্রতিরোধ করে। কিন্তু এক পর্যায়ে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালানো শুরু করে। এ সময় কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হয়। আহতদের মধ্যে শ্যামল হেমব্রম বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেন। আর আখক্ষেত থেকে উদ্ধার করা হয় মঙ্গল মার্ডির মরদেহ। মারাত্মকভাবে জখম হন চরণ সরেণ, বিমল কিস্কু ও দ্বিজেন টুডু। দ্বিজেন টুডুর চোখে গুলি লাগে। স্থানীয়রা স্ব-উদ্যোগে নানা প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে আহতদের উদ্ধার করে। হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে আহতের উদ্ধার ও জরুরিভাবে চিকিৎসা দেয়ার কোনো ব্যবস্থা নিতে দেখা যায় না। বরং গুলিবদ্ধি হয়ে আহত মানুষ যখন রংপুর হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যায় তখন আহতদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

চোখে গুলি লাগায় দ্বিজেন টুডু যখন মেডিক্যালে পৌঁছেন তখন তাঁর চোখ দিয়ে রক্তপাত হচ্ছিল। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে প্রথমে থানায় নিয়ে যায়। সময়মতো তাঁর চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হয়নি। ফলে তাঁর গুলিবিদ্ধ চোখ এখন নষ্ট হওয়ার পথে। চরণ সরেণের গুলি লেগেছিল পায়ে। তিনি রংপুর মেডিক্যালে অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। জ্ঞান ফেরার পর দেখেন তাঁর হাতে হাতকড়া পরিয়ে খাটের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। বিমল কিস্কুর দুই পায়ে গুলি লেগেছিল। অর্থোপেডিক শাখার মেঝেতে শুয়ে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। তাঁকেও গুরুতর আহত অবস্থায় হাতকড়া পরিয়ে জানালার সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। বিমল কিস্কুর স্ত্রীকে ফোন করে অজ্ঞাতনামা কেউ একজন হত্যা করার হুমকি দেয়। তিনি তখন তাঁর স্বামীর পাশে অবস্থান করছিলেন। পুলিশ পাশেই ছিল। কিন্তু কে বা কারা হত্যার হুমকি দিল, সেটাও তদন্ত করা হলো না।

৬ নভেম্বর সকালে পুলিশের গুলিবর্ষণের পর দুপুর নাগাদ শুরু হয় ঘরে ঘরে তল্লাশির নামে অবাধ লুটপাট। ওই সময় ঘরের টিন, গরু-ছাগল, হাস-মুরগি, থালা-বাটি, পোশাক-আশাক, সঞ্চিত ফসল, নগদ অর্থসহ তাৎক্ষণিকভাবে যা বহনযোগ্য, সব কিছুই এক এক করে লুট করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাদের প্রত্যক্ষ মদদে তাদের

ধারাবাহিক আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগের পর অধিকাংশ মানুষ আশপাশের গ্রামে আশ্রয় নেয়। অনেকে বাধ্য হয়ে গোবিন্দগঞ্জ ছেড়ে যায়। পরদিন ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে ঘরহারা মানুষ এসে দেখে, পুড়িয়ে দেয়া ঘরবাড়ি ও বাড়ির আঙিনায় লাগানো শাকসবজি ট্রাক্টর দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে। ক্ষেতের ফসল ট্রাক্টরের চাকায় পিষে যাচ্ছে। টিউবওয়েলসহ অন্যান্য সম্পদ তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর কাঁটাতার দিয়ে জমির চারদিকে বেড়া নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

সাঙ্গপাঙ্গরা এই লুটপাটে অংশ নেয়।

স্থানীয় জনগণের মতে, পুরো ঘটনার সাথে জড়িত ছিলেন গাইবান্ধা-৪ আসনের এমপি আবুল কালাম আজাদ, সাপমারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাকিল আকন্দ বুলবুল, রংপুর চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল আউয়াল, গোবিন্দগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল হান্নান, গোবিন্দগঞ্জ থানার ওসি সুব্রত কুমার সরকার, কাঁটাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. রেজাউল করিম রফিক এবং আরো অনেকে। পত্র-পত্রিকায়, নানা সূত্রে ইতিমধ্যে এই নামগুলো প্রকাশও পেয়েছে।

এই জমি অধিগ্রহণের সময় ১৫টি আদিবাসী ও ৫টি বাঙালি গ্রাম উচ্ছেদ করা হয়। উচ্ছেদ অভিযানে প্রায় ১ হাজার ২০০ দরিদ্র কৃষক পরিবার কৃষিজমি হারায় এবং মোট ২ হাজার ৫০০ পরিবার তাদের বসতভিটা হারিয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়।

এরপর সন্ধ্যায় শুরু হয় ঘরবাড়িতে আগুন লাগানো। এ সময় অসহায় নারী ও শিশুরা শেষ সম্পদ হিসেবে তাদের জিনিসপত্র যেটুকু ছিল তা আনতে যেতে চায়। কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের বাধা দেয়া হয়। চোখের সামনে তাদের ঘরবাড়ি, সম্পদ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এ সময় শত শত নারী ও শিশু আহাজারি করেছে। কিন্তু তাদের সম্পদ রক্ষায় পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা এগিয়ে আসেনি। বরং প্রথম দিকে জানা গিয়েছিল, পুলিশের সামনেই একজন আগুন লাগাচ্ছে ঘরবাড়িতে। তখন পর্যন্ত মিডিয়া পুলিশ সরাসরি আগুন লাগিয়েছিল–এ রকম কোনো ভিডিও প্রকাশ করেনি। এমনভাবে প্রচার করা হয়েছিল যে পুলিশকে আক্রমণ করেছিল সাঁওতাল ও বাঙালিরা এবং পুলিশ সেখানে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হাজির হয়েছিল। তবে পরে আলজাজিরার প্রকাশ করা ভিডিওতে পুলিশকে সরাসরি অগ্নিসংযোগ করতে দেখা গেছে।

এই ধারাবাহিক আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগের পর অধিকাংশ মানুষ আশপাশের গ্রামে আশ্রয় নেয়। অনেকে বাধ্য হয়ে গোবিন্দগঞ্জ ছেড়ে যায়। পরদিন ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে ঘরহারা মানুষ এসে দেখে, পুড়িয়ে দেয়া ঘরবাড়ি ও বাড়ির আঙিনায় লাগানো শাকসবজি ট্রাক্টর দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে। ক্ষেতের ফসল ট্রাক্টরের চাকায় পিষে যাচ্ছে। টিউবওয়েলসহ অন্যান্য সম্পদ তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর কাঁটাতার দিয়ে জমির চারদিকে বেড়া নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

২০০৪ সালে মিলটি আবারও বন্ধ ঘোষণার পর মিল কর্তৃপক্ষ জমি ইজারা দেয়ার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তারা বিঘাপ্রতি ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতাকর্মী ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের আখ চাষের শর্তে ইজারা নেয়। কিন্তু তারা ইজারার শর্ত ভঙ্গ করে উফশী ধান, হাইব্রিড ভুট্টা, গম, সরিষা, আলু ও তামাক চাষ শুরু করে। এক পর্যায়ে ইজারা গ্রহণকারীরা মিলের জমিতে পুকুর কেটে তাতে মাছ চাষ শুরু করে এবং পুকুরের মাটি দিয়ে ইটভাটা তৈরি করে।

১.২ এরপর যা হচ্ছে

পুলিশ প্রশাসন ৪২ জনের নাম উল্লেখ করে এবং প্রায় ৩০০ জনকে অজ্ঞাতনামা করে একাধিক মামলা দায়ের করে। পরদিন থেকে ওই অঞ্চলে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়। চলতে থাকে ধারাবাহিকভাবে ধরপাকড়ের কাজ। কিন্তু গুলিতে নিহত বা আহত বিষয়ে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো হত্যা মামলা দায়ের করা হয়নি, যা ছিল বাধ্যতামূলক। তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়নি। বরং প্রশাসনের পক্ষ থেকে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়ার ঘটনাটিকে বারবার অস্বীকার করা হয়েছে। ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলেছে। নিহতদের পরিবারের পক্ষ থেকে করতে যাওয়া মামলা গ্রহণ করা হয়নি।

৬ নভেম্বর তাদের সমস্ত সম্পদ লুট হয়ে যাওয়ার পর সাঁওতাল গ্রামবাসী এক কাপড়ে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়। এর পর থেকে তারা খোলা আকাশের নিচেই বাস করতে শুরু করে। এর মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া ও পুলিশি ক্যাম্প বসিয়ে বাসিন্দাদের মূল ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। ফলে তারা খাদ্যদ্রব্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কোনো কিছু ক্রয় করতে বাজারে যেতে পারছিল না। বেঁচে থাকতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও সংগঠনের ত্রাণের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছিল। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে যাওয়াও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সারা দেশের মানুষের অব্যাহত বিক্ষোভ ও চাপের মুখে ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এবং আক্রান্ত গ্রামগুলোরও বাসিন্দা নয়, এমন ব্যক্তিকে ১০ দিন পর পুলিশ দিয়ে ডেকে এনে তাকে বাদী করিয়ে সাঁওতালদের পক্ষ থেকে একটি মামলা সাজানো হয়, যে মামলায় বলা হয়েছে কে বা কারা এখানে আগুন দিয়েছে ইত্যাদি। মূল অপরাধীদের আড়াল করতেই এ মামলা করা হয়েছে। এরপর সমাজের নানা স্তরের মানুষের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের চাপে ঘটনার প্রায় তিন সপ্তাহ পর প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের একটা জিডি বা সাধারণ ডায়েরি গ্রহণ করে, যেটাকে মামলা বলে প্রচার করা হয়।

২. ভূমি উদ্ধার আন্দোলনের ইতিহাস

২.১ গড়ে ওঠা আন্দোলন

রংপুর (মহিমাগঞ্জ) চিনিকলের জন্য ১৯৫৪-৫৫ অর্থবছরে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ৫ নং সাপমারা ইউনিয়নের সাপমারা, রামপুর, মাদারপুর, নারাঙ্গাবাদ ও চকরাহিমপুর মৌজার ১৮৪২.৩০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। এলাকাটি সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম নামে পরিচিত। কিন্তু জমি অধিগ্রহণের সময় কোনো আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি; যদিও পূর্ব পাকিস্তান সরকারের খাতা-কলমে ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। এই জমি অধিগ্রহণের সময় ১৫টি আদিবাসী ও ৫টি বাঙালি গ্রাম উচ্ছেদ করা হয়। উচ্ছেদ অভিযানে প্রায় ১ হাজার ২০০ ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার কৃষিজমি হারায় এবং মোট ২ হাজার ৫০০ পরিবার তাদের বসতভিটা হারিয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। পরে ১৯৬২ সালে আনুষ্ঠানিক চুক্তির মাধ্যমে রংপুর সুগারমিল উল্লিখিত জমিতে আখ চাষের অধিকার পায়। পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের সঙ্গে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ওই চুক্তির ৪ নং শর্ত অনুযায়ী, যে উদ্দেশ্যে এই জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, তা ব্যতীত অন্য কোনো কাজে এই সম্পত্তি ব্যবহার করা

যাবে না। ৩ নং শর্ত অনুযায়ী, ভূমির প্রকৃতি বা চরিত্র পরিবর্তন করা যাবে না। ৬ নং শর্ত অনুযায়ী, এই জমি অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চাইলে সরকারের লিখিত আদেশ লাগবে। আর ৫ নং শর্ত অনুযায়ী, যে উদ্দেশ্যে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, তা ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হলে প্রাদেশিক সরকারের কাছে ওই জমি হস্তান্তর করতে হবে, যাতে সরকার অধিগ্রহণকৃত জমি মুক্ত করে ফেরত দিতে পারে। চুক্তিপত্রে আরো উল্লেখ করা হয়, '...১৮৪২.৩০ একর সম্পত্তি ইক্ষু ফার্ম করার জন্য লওয়া হইল। উক্ত সম্পত্তিতে ইক্ষু চাষের পরিবর্তে যদি কখনো, কি কোনো সময় অন্য কোনো ফসল উৎপাদিত হয় অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না করিয়া অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় এবং তাহা প্রকৃত উদ্দেশ্যের বিপরীত হয় অথবা এই রকম ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটিলে এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন অধিগ্রহণকৃত ১৮৪২.৩০ একর সম্পত্তি সরকার বরাবর ফেরত (সারেন্ডার) প্রদান করিবেন। দেশের সরকার বাহাদুর উক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া (রেস্টোরেশন) যাইতে পারিবেন।' এমনকি জমির আইল পর্যন্ত অক্ষুণ্ন রাখার শর্ত রয়েছে সেখানে।

> গাইবান্ধার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ২০১৫ সালের ২১ জুন একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। প্রতিবেদনে আখের বিপরীতে অন্য ফসল চাষের সত্যতা স্বীকার করা হয়।

১৯৬২ সালে এই চিনিকল স্থাপনের পর প্রথম কয়েক বছর লাভজনক অবস্থায় ছিল। ১৯৭২ সালের পর থেকে মাঝেমধ্যে লোকসানের মুখে পড়তে থাকে। ২০০২ সালে চিনিকলটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পরের বছর চালু করে ২০০৪ সালের ৩১ মার্চ কাঁচামালের ঘাটতি ও মূলধন সংকট দেখিয়ে মিলটি আবারও বন্ধ (লে অফ) ঘোষণা করা হয়। ২০০৬ সালের ১৬ জুলাই মিলটি পুনরায় চালু করার নির্দেশ দেয় শিল্প মন্ত্রণালয়।

> ২০১৬ সালের ১০ মে গাইবান্ধা জেলা প্রশাসন উল্লিখিত ১৮৪২.৩০ একর জমি 'অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত' দেখিয়ে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করে।

বস্তুত চিনিকল কর্তৃপক্ষ সমস্ত নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে ১৯৯৩ সাল থেকেই মিলের আখ চাষের জমি ব্যক্তি পর্যায়ে ইজারা দেয়া শুরু করে। ২০০২ সালে চিনিকলটি বন্ধ ঘোষণা করার পরই জমির মূল মালিকরা তাঁদের জমি ফেরত দেয়ার দাবি জানান। ২০০৪ সালে মিলটি আবারও বন্ধ ঘোষণার পর মিল কর্তৃপক্ষ জমি ইজারা দেয়ার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তারা বিঘাপ্রতি ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতাকর্মী ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের আখ চাষের শর্তে ইজারা নেয়। কিন্তু তারা ইজারার শর্ত ভঙ্গ করে উফশী ধান, হাইব্রিড ভুট্টা, গম, সরিষা, আলু ও তামাক চাষ শুরু করে। এক পর্যায়ে ইজারা গ্রহণকারীরা মিলের জমিতে পুকুর কেটে তাতে মাছ চাষ শুরু করে এবং পুকুরের মাটি দিয়ে ইটভাটা তৈরি করে। চিনিকলের জমিতে আখ চাষের পরিবর্তে অন্য ফসল চাষ ও ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার শুরু হলে যাঁদের উচ্ছেদ করে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে থাকে। তাঁরা অধিগ্রহণের শর্ত অনুযায়ী জমি ব্যবহার না করে ইজারা দেয়ায় মিল কর্তৃপক্ষের নিকট বিচ্ছিন্নভাবে জমি ফেরত দেয়ার দাবি জান াতে থাকেন। এক পর্যায়ে তা সাঁওতাল ও বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে রূপ নেয়।

> এর পরপরই রহিম আফরোজ গ্রুপ ওই বিতর্কিত জমিতে তাদের শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার প্রস্তাব রাখে।

২.২ সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম ভূমি উদ্ধার সংগ্রাম কমিটি

২০১৪ সালের মার্চে গড়ে ওঠে সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম ভূমি উদ্ধার সংগ্রাম কমিটি। কমিটির পক্ষ থেকে উপজেলা প্রশাসন, জেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনে যোগাযোগ করা হয়। মিলের প্রকৃত অবস্থা অবহিত করে জমি ফেরত দেয়ার দাবি জানানো হয়। এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে গাইবান্ধা জেলা প্রশাসন ঘটনাটি তদন্ত করার উদ্যোগ নেয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের (রাজস্ব) নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি ২০১৫ সালের ৩০ মার্চ সরেজমিনে সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম এলাকা পরিদর্শন করে। এ সময় গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং সার্ভেয়ার উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জেনারেল ম্যানেজার এবং অভিযোগকারীরা। তাঁদের সাক্ষ্যগ্রহণ ও বক্তব্য শোনা হয়। পরে গাইবান্ধার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ২০১৫ সালের ২১ জুন একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। প্রতিবেদনে আখের বিপরীতে অন্য ফসল চাষের সত্যতা স্বীকার করা হয়। এ ক্ষেত্রে চিনিকল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ছিল, চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সাহেবগঞ্জ খামারের ১ হাজার ৫০২ একর জমি আখ চাষের পাশাপাশি অন্যান্য ফসল আবাদ করার জন্য ইজারা দেয়া হচ্ছে। গাইবান্ধা জেলা প্রশাসন ২০১৫ সালে তদন্তকালে সব পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনা করে অধিগ্রহণ পর্বে উচ্ছেদ হওয়া মানুষের অভিযোগের সত্যতার প্রমাণ পায়।

এর পরই রেস্টোরেশন দ্বারা ১৮৪২.৩০ একর জমি ফেরত, সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে লুটেরা ও দুর্নীতিবাজ চিনিকলের কর্মকর্তাদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার, বেআইনিভাবে জমি দখল ও ইজারার নামে লুটপাটের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার এবং ভূমিদস্যু ও দালালদের প্রতিহত করার দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে আন্দোলনকারীরা বাগদাফার্ম এলাকায় প্রতিবাদ সমাবেশ করে। ২০১৬ সালের ২৩ জানুয়ারি ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে তারা তাদের দাবির পক্ষে সমাবেশ করে। সমাবেশ শেষে মিছিল করে প্রেস ক্লাবে যায়। ১০ এপ্রিল ভূমি উদ্ধার কমিটি ৩২ কিলোমিটার গণপদযাত্রার আয়োজন করে। এই পদযাত্রা শেষে গাইবান্ধা জেলা শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে সমাবেশ করা হয়। সমাবেশ থেকে দুই মাসের আল্টিমেটাম দেয়া হয়। তা ছাড়া প্রতি শনিবার বাগদাফার্ম এলাকার কাঁটামোড়ে নিয়মিত বিক্ষোভ সমাবেশ চলতে থাকে। তাদের দাবির সমর্থনে সেমিনার, মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারণা চলতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে মিল কর্তৃপক্ষ বেআইনিভাবে দেয়া ইজারার একটি অংশ বাতিল করে দেয়। পরে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে আখ চাষের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আখ চাষ ও মিল চালু করতে যে পুঁজির প্রয়োজন তা মিল কর্তৃপক্ষ সংগ্রহ করতে পারবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে। চিনিকল কর্তৃপক্ষের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৬০০ একর জমিতে আখ আবাদ করার পরিকল্পনা থাকলেও স্থানীয় কৃষকরা মনে করে যে

৪০০ একর জমিতে আখ চাষ করা হয়েছে। কৃষকরা আরো লক্ষ্য করে যে বীজ বপনের সময় জয়পুরহাট চিনিকলের গাড়ি ও কর্মচারীরা হাজির ছিলেন। এ থেকে ধারণা করা হয় যে এই আখ জয়পুরহাট চিনিকলের জন্য আবাদ করা হয়েছে। ইজারা দেয়া কয়েক শ একর জমিতে ধান চাষ অব্যাহত রয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন। আর বাদবাকি জমি রয়েছে পতিত।

এদিকে আন্দোলন চলাকালে ২০১৬ সালের ১০ মে গাইবান্ধা জেলা প্রশাসন উল্লিখিত ১৮৪২.৩০ একর জমি 'অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত' দেখিয়ে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করে। প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়, মহিমাগঞ্জ সুগারমিলের জমি অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত, এবং এটা ব্যক্তিমালিকানাধীন না হওয়ায় ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন নেই। ওই প্রস্তাবপত্রে আরো দাবি করা হয়, 'প্রস্তাবিত এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ জেলার মাননীয় জাতীয় সংসদ সদসবৃন্দ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ, রাজনৈতিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তি, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং সব শ্রেণি ও পেশার মানুষ পূর্ণ সর্মথন দিয়েছেন'। জেলা প্রশাসন এই বিরোধপূর্ণ জমিকে 'অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত' বলায় আরো বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এর পরপরই রহিম আফরোজ গ্রুপ ওই বিতর্কিত জমিতে তাদের শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার প্রস্তাব রাখে। এই সংবাদ প্রকাশ পেলে আন্দোলনরত মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তারা ৩০ জুন ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ দিবসে বাগদাফার্ম এলাকায় সমাবেশ করে। সমাবেশে প্রায় ৬ হাজার নারী-পুরুষ তাদের জমি পুনরুদ্ধারের সিদ্ধান্ত নেয়। ১ জুলাই থেকে আন্দোলন নতুন মাত্রা নেয়। ওই জমিতে ঘর তোলার কাজ শুরু করে উচ্ছেদ হওয়া সাঁওতাল ও বাঙালিদের ওয়ারিশরা। তারা ৬ জুলাই পর্যন্ত প্রায় ২ হাজার বসতবাড়ি নির্মাণ করে। ১২ জুলাই মিল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ এই বসতির ওপর হামলা চালায়। ওই দিন পুলিশের গুলিতে মাঝি হেমব্রম, মাইকেল মার্ডি, সোনাল মুমরু ও মুংলি টুডু আহত হন। পরে সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম ভূমি উদ্ধার সংগ্রাম কমিটির সাধারণ সম্পাদকসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে জোর করে জমি দখল করার অভিযোগে এফআইআর করে মিল কর্তৃপক্ষ। এরপর কোর্টের অনুমতি ছাড়াই ৬ নভেম্বর পুলিশি উচ্ছেদ অভিযান সংঘটিত হয়।

> ২০০৪ সালে দেশে পর্যায়ক্রমে পাঁচটি বেসরকারি চিনি রিফাইনারি প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারা র সুগার আমদানি ও পরিশোধন করে সাদা চিনি উৎপাদন ও বাজারজাত শুরু করে। এসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য অবাধ বাজারের প্রয়োজন ছিল। সে কারণেই ধারাবাহিক লোকসানের কারণ দেখিয়ে ২০০২ সালে এক বার এবং ২০০৪ সালে দ্বিতীয়বার মিলটি বন্ধ করে দেয়া হয়।

> রাষ্ট্রীয়ভাবে চিনিকলগুলোকে এভাবে অসম প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দিয়ে, কোনো প্রণোদনা ছাড়াই ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য বারবার চাপ সৃষ্টি করা হয়। কখনো ট্যারিফ কমিশন থেকে, কখনো অর্থমন্ত্রী নিজেই এই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে বন্ধ করে দেয়ার কথা বলেন। কিন্তু চিনির বাজার নিয়ন্ত্রণ বা চিনিকলগুলোর অব্যবস্থাপনা কমানো বা উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর কোনো উদ্যোগ নেয়া হয় না।

২.৩ উত্তরাঞ্চলে সাঁওতাল ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর চলমান উচ্ছেদ প্রক্রিয়া

উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মানুষরা ১৯৬২ সালেই প্রথম জমি থেকে উচ্ছেদের শিকার হয়েছে তা নয়। তারা ব্রিটিশ আমল থেকেই উচ্ছেদের শিকার। আজ যে অঞ্চলকে আমরা উত্তরাঞ্চল বলছি, তার আরেক পরিচয় বরেন্দ্রভূমি। এই বরেন্দ্র অঞ্চল গড়েই উঠেছে সাঁওতাল ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর শ্রমে। তাদের জীবনচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ভূমি। এই ভূমিতে তাদের সমষ্টিগত অধিকার ছিল, ব্যক্তিমালিকানা ছিল না। বংশপরম্পরায় তারা ওই জমি ভোগদখল করেছে। ভোগদখলের সূত্রে সংশ্লিষ্ট জমির ওপর তাদের ঐতিহ্যগত অধিকার ছিল। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজা ও জমিদার ওই জমি তাদের পত্তন দিয়েছে। তারা রুক্ষ, শুষ্ক, জঙ্গলাকীর্ণ ও অনাবাদি জমি হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে তা আবাদের আওতায় নিয়ে এসেছে। সেই সময় দলিল-দস্তাবেজের প্রচলন বরেন্দ্রভূমির অধিবাসীদের মধ্যে ছিল না। ফলে ইংরেজ আমলের বিভিন্ন সার্ভে-সেটেলমেন্টের সময় এসব জমিতে কী ধরনের পত্তন দেয়া হয়েছিল তার দলিল-দস্তাবেজ না থাকায় তাদের অধিকাংশ বিভিন্ন সময়ে ভূমিচ্যুত হয়। ভূমি মালিকানার ব্যাপক রদবদল ঘটে।

১৯৩৩ সালে জিতু ও সামুর নেতৃত্বে উত্তরাঞ্চলে ব্রিটিশবিরোধী সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটে। ওই সময় প্রায় ২০ হাজার সাঁওতাল বাস্তুচ্যুত হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে যে দাঙ্গা, তার ফলে উত্তরাঞ্চলে তাদের একটি অংশ আবারও বাস্তুচ্যুত হয়। ১৯৫০ সালে নাচোলের কৃষক বিদ্রোহের সময় সাঁওতালরা তাদের জমি হারায়। ১৯৬২ সালে উত্তরবঙ্গের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তাদের অনেককেই জীবনরক্ষায় ঘরবাড়ি ছাড়তে হয়। আর সেই বছরই হয়েছিল ভূমি রেকর্ডের কাজ। ফলে তাদের পক্ষে জমি দখলে রাখা সম্ভব হয়নি। রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় তাদের জমি ক্ষমতাসীনরা রেকর্ড করে নেয়। (কামাল ও অন্যান্য, ২০০২)। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটেও তাদের অনেকের জমি শত্রু সম্পত্তিভুক্ত করে দখল করে নেয়া হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় উত্তরাঞ্চলের অনেক অফিস-আদালতের কাগজপত্র ও জমির ভলিউম পুড়ে যায়। এই ভলিউম পুড়ে যাওয়ার সূত্র ধরে অসংখ্য জাল দলিল তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েও তাদের জমি দখল করা হয়। স্বাধীনতার পরও তা তারা ফেরত পায়নি।

১৯৭২ সালের সংবিধানেও ভূমি মালিকানার ক্ষেত্রে যৌথ মালিকানার বিষয়টির স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। ফলে সাঁওতালসহ এ ধরনের জাতিগোষ্ঠী, যারা শত বছর ধরে যৌথ মালিকানায় জমি ভোগদখল করছিল, তাদের জমির ওপর অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। ১৯৮৪ সালে নতুন ভূমি নীতিমালা তৈরি ও খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করার আইনগত স্বীকৃতি যখন দেয়া হয় তখন উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলায় প্রায় ২ লাখ ৬০ হাজার একর খাসজমি দেখানো হয়। তার একটি বড় অংশ ছিল সাঁওতালসহ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর জমি, যারা যৌথ মালিকানায় জমি ভোগদখল করত। এমনকি এ সময় রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করে গুচ্ছগ্রাম তৈরি করার নজির রয়েছে। (কামাল ও অন্যান্য, ২০০২)। অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ

ধারাবাহিকতায় গোবিন্দগঞ্জের বাগদাফার্মে সাঁওতাল ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করে চিনিকল প্রতিষ্ঠা করা হয়। আবার সেই চিনিকলকে অব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধ্বংস করে এখন দখলকৃত জমি অন্য কারণে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ভূমিবঞ্চিত সাঁওতাল ও বাঙালিদের হত্যা, লুণ্ঠন ও নির্যাতনের মাধ্যমে নিজ রাষ্ট্রেই সম্পূর্ণরূপে উদ্বাস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে।

৩. শিল্প উন্নয়ন প্রশ্নে ভূমি উদ্ধার আন্দোলন

৩. ১ রংপুর রাষ্ট্রীয় চিনিকলের সার্বিক অবস্থা

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের (বিএসএফআইসি) মোট ১৫টি চিনিকলের মধ্যে মাত্র পাঁচটি চিনিকলের নিজস্ব বড় বাণিজ্যিক খামার আছে। এগুলো হলো কেরু, সেতাবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, নর্থ বেঙ্গল ও রংপুর চিনিকল। বাকি ১০টি চিনিকল কৃষকদের আখ সরবরাহের ওপর নির্ভর করে চলছে। এই পাঁচটির মধ্যে সেতাবগঞ্জ ও রংপুর চিনিকলের উৎপাদন সর্বনিম্ন। রংপুর চিনিকল ১৯৬২ সালের পর যখন উৎপাদনে যায়, তখন তা লাভজনক ছিল। পরে অব্যবস্থাপনা, অদক্ষতা ও লুটপাটের ফলে মিলটি লোকসান দিতে থাকে। ইতিমধ্যে ২০০৪ সালে দেশে পর্যায়ক্রমে পাঁচটি বেসরকারি চিনি রিফাইনারি প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারা র সুগার আমদানি ও পরিশোধন করে সাদা চিনি উৎপাদন ও বাজারজাত শুরু করে। এসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য অবাধ বাজারের প্রয়োজন ছিল। সে কারণেই ধারাবাহিক লোকসানের কারণ দেখিয়ে ২০০২ সালে এক বার এবং ২০০৪ সালে দ্বিতীয়বার মিলটি বন্ধ করে দেয়া হয়। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে মিলটি যখন পুনরায় চালু করা হয় তখন বেসরকারি চিনি রিফাইনারির কারণে রাষ্ট্রীয় চিনিকলগুলো তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে। এভাবে গত আট বছরে রংপুর চিনিকলের লোকসান হয়েছে মোট ১৩৪ কোটি টাকা। এ পর্যন্ত মোট লোকসান ৩০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এভাবেই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিনির বাজার নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করার সুযোগ দেয়া হয় এবং একই সাথে চিনির স্থানীয় চাহিদা মেটাতে আমদানি নির্ভরতা বাড়িয়ে তোলা হয়।

> চিনিকলের কাছ থেকে আখ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সার/কীটনাশক/বীজ সংগ্রহ করতে হলে কৃষককে প্রায় ১১ শতাংশ সুদ প্রদান করতে হয়। এগুলো সময়মতো পর্যাপ্ত পাওয়া যায় না, বেশি দামে কিনতে হয় এবং অনেক সময় ওজনে কম দেয়া হয় বলে চাষিরা অভিযোগ করে। বিক্রির টাকা আদায় করার জন্য কৃষককে মাসের পর মাস ধরনা দিতে হয়।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এবং বাংলাদেশ পুষ্টি কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী মাথাপিছু বার্ষিক চিনির চাহিদা ৮.৫০ কেজি। সেই হিসাবে বর্তমানে দেশে চিনির বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১৪ লাখ মেট্রিক টন বলে মনে করা হয়। (বিএসএফআইসি, ২০১৪)। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় চিনিকলগুলো চিনি উৎপাদন করেছে ৭৭ হাজার ৪৫০ মেট্রিক টন। আর এদিকে পাঁচটি বেসরকারি রিফাইনারি প্রতিবছর উৎপাদন করতে পারে প্রায় ৩২ লাখ মেট্রিক টন চিনি। এই রিফাইনারিগুলোর আমদানীকৃত চিনি পরিশোধনের ক্ষমতা বার্ষিক চাহিদার তুলনায় বেশি হওয়ায় রাষ্ট্রীয় চিনিকলগুলোকে এই বেসরকারি রিফাইনারিগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে প্রতিবছর রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয়।

> রাষ্ট্র কি তাহলে মাত্র ৫০ লাখ টাকা আয় করার জন্য দিনের পর দিন মানুষকে তাদের জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার নীতি সমর্থন করে যাচ্ছে?

আজ চিনির বাজারের বাস্তবতা হলো, যখন আন্তর্জাতিক বাজারে চিনির দাম কম থাকে তখন দেশীয় বাজারে বেসরকারি রিফাইনারিগুলো চড়া দামে চিনি বিক্রি করে। আবার কখনো বাজার একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রকৃত দামের চেয়ে কম দামে বিক্রি করে। চিনির বাজার এই বেসরকারি রিফাইনারিগুলোর দখলে ও নিয়ন্ত্রণে থাকায় তার মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি এখন আর চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার হাতে, ধরতে গেলে, নেই। ফলে রিফাইনারিগুলো যখন কম দামে চিনি বিক্রি করে তখন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোও উৎপাদন খরচের চেয়ে কম দামে চিনি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। অনেক প্রতিষ্ঠানে চিনি অবিক্রীত থেকে নষ্ট হয়ে যায়। আবার চিনির বাজারমূল্য বাড়লে সরকারি চিনিকলগুলোকে নির্ধারিত দামেই চিনি বিক্রি করতে হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়ভাবে চিনিকলগুলোকে এভাবে অসম প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দিয়ে, কোনো প্রণোদনা ছাড়াই ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য বারবার চাপ সৃষ্টি করা হয়। কখনো ট্যারিফ কমিশন থেকে, কখনো অর্থমন্ত্রী নিজেই এই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে বন্ধ করে দেয়ার কথা বলেন। কিন্তু চিনির বাজার নিয়ন্ত্রণ বা চিনিকলগুলোর অব্যবস্থাপনা কমানো বা উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর কোনো উদ্যোগ নেয়া হয় না। অথচ এই চিনিকলগুলোতে ১৬ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছিল। উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পাঁচ লাখ চাষিসহ প্রায় ৫০ লাখ মানুষের জীবিকা এই শিল্পের সাথে যুক্ত। কৃষিভিত্তিক চিনিশিল্পকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ এলাকায় রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, ব্যাংক, হাটবাজার ও অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন অবকাঠামো ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। চিনির উপজাত চিটাগুড়, আখের ছোবড়া ইত্যাদি কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করেও বিভিন্ন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে। চিনির উপজাত চিটাগুড়, আখের ছোবড়া ইত্যাদি কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করেও বিভিন্ন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে। এসব প্রতিষ্ঠানে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছিল। এখন রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারকদের কারণে তা বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে।

এখানে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, যত দিন চিনিকলটি উৎপাদনমুখী ছিল এবং খামারের জমি ইজারা দেয়া হয়নি, তত দিন কিন্তু প্রান্তিক মানুষরা ভূমি পুনরুদ্ধারের প্রশ্নটি কখনো উত্থাপন করেনি।

৩.২ রংপুর চিনিকলের বর্তমান চিত্র : সাঁওতালদের ভূমি দখল কেন জরুরি নয়

২০০৭-০৮ অর্থবছরে পুনরায় চালু করা হলেও ওই বছর মিলটি চালু ছিল মাত্র ৩৩ দিন। এর পর থেকে বছরে এখন ১৫ থেকে ২৫ দিন চিনিকলটি চালু রাখা হচ্ছে। আবার অন্য ১৪টির তুলনায় এই চিনিকলে উৎপাদন সর্বনিম্ন। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে উৎপাদন হয়েছিল মাত্র ৫ হাজার ৩২৫ টন। ২০১৩-১৪ মৌসুমে ৫ হাজার ২৬৮ এবং ২০১৪ মৌসুমে ২ হাজার ৪৪০ টন। এর মধ্যে ২০১৩ সালে উৎপাদিত চিনির মধ্যে ৩ হাজার ২৪৬ টন দুই বছর ধরে বিক্রি না হওয়ায় এখনো গুদামজাত হয়ে রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। অন্যদিকে খামারের জমি আয়বৃদ্ধির জন্য ইজারা দেয়া হলেও মিল কর্তৃপক্ষ

শ্রমিক-কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন পরিশোধ করতে পারে না। ২০১৫ সালের ১২ জুলাই শ্রমিক-কর্মচারীরা তিন মাসের বকেয়া বেতন ও ভাতার জন্য মিল চত্বরে বিক্ষোভ করেন। মিল কর্তৃপক্ষ নিজস্ব জমি ইজারা দিয়ে যে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে আখ চাষের উদ্যোগ নেয়, সেই পরিকল্পনাও সফল হয়নি। যেমন–২০১১ অর্থবছরে চাষিদের জমিতে আখ চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৮ হাজার একর। কিন্তু চাষ হয়েছিল ৩ হাজার ৯৫৭ একর।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক বিবেচনা করেও সাঁওতাল ও বাঙালিদের ভূমি তাদের ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব। চিনিশিল্পের উন্নয়নে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে এক দিক থেকে যেমন চিনিশিল্পের বিকাশ ঘটানো সম্ভব, তেমনি ভূমি কৃষকের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এবং আখ চাষে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা দিয়ে ভূমির উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেশের আয় বাড়ানো সম্ভব।

২০১৪-১৫ সালে চিনি উৎপাদনে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে যেসব চিনিকল তার মধ্যে রয়েছে সেতাবগঞ্জ চিনিকল (২৩২৭ মেট্রিক টন) ও রংপুর চিনিকল (২৪৪০ মেট্রিক টন)। এই দুটি চিনিকলেরই বড় খামার রয়েছে। মোট চিনি উৎপাদনে এগিয়ে থাকা ১৩টি চিনিকলের মধ্যে যে ১০টির উৎপাদন ৪০০০ মেট্রিক টনের ওপরে সেগুলোর মাত্র তিনটির (কেরু, নর্থ বেঙ্গল ও ঠাকুরগাঁও সুগার মিল) বড় বাণিজ্যিক ফার্ম রয়েছে। (সূত্র : বিএসএফআইসি বাজেট ২০১৫-১৬)। শুধু তা-ই নয়, ২০০৭-০৮ সালে মিলটি পুনরায় চালু হওয়ার পর থেকেও প্রায় প্রতিবছরই রংপুর চিনিকল অন্য ১৪টি চিনিকলের উৎপাদনের সাথে তুলনা করলে সর্বনিম্ন উৎপাদন করেছে। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, খামারের মালিকানার সাথে চিনি উৎপাদন বৃদ্ধির আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে কি না। অর্থাৎ চিনি উৎপাদন কম হওয়ার পেছনে আরো কারণ রয়েছে। চিনিশিল্পের উন্নয়ন নিয়ে কথা বলতে হলে সেই কারণগুলোর দিকে অবশ্যই দৃষ্টি দিতে হবে। সাঁওতাল ও দরিদ্র বাঙালিদের জমি দেশের উন্নয়নে ব্যবহার করা হচ্ছে–এমন ধারণা পোষণ করার আগে এ বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা আগে জানতে হবে।

এত জমি থাকতেও কেন আখ চাষ না করে চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা অন্য ফসল চাষে জমি ইজারা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে? যে কারণগুলো দেখানো হয় তার মধ্যে প্রথম কারণটি হলো আখ চাষের জমির উর্বরতা রক্ষার জন্য এক বছর পর পর ইক্ষুর পরিবর্তে অন্য ফসল চাষ করার রেওয়াজ রয়েছে। কিন্তু এটাই যদি একমাত্র কারণ হতো তাহলেও ২০০৯-১১ সালে পুরো খামারের মাত্র ১৫ শতাংশ জমিতে ইক্ষু চাষ না হয়ে আরো বেশি জমিতে চাষ হতে পারত। অর্থাৎ এই অল্প জমি চাষ হওয়ার কারণ শুধু উর্বরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হতে পারে না। এ ছাড়া আমরা জানি, তামাক চাষ করলে জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। ইক্ষু চাষের জমির উর্বরতা বৃদ্ধিই যদি লক্ষ্য হয় তাহলে সেই জমিতে তামাক চাষ করার অনুমতি কেন দেয়া হবে? দ্বিতীয় কারণটি দেখানো হয়, ইক্ষু চাষ কম লাভজনক বলে কৃষকরা ইক্ষু চাষ করতে আগ্রহী নয়। কিন্তু এর সমাধান হিসেবে যদি জমি ইজারা দিয়ে অন্য ফসল উৎপাদন করা হয় তাহলে কি চিনিশিল্পের উন্নয়ন সম্ভব? নাকি চিনিশিল্পকে বাঁচাতে হলে সরকারের প্রয়োজন ইক্ষু চাষে প্রণোদনা দেয়া? এ প্রসঙ্গে সত্তরের দশকের বাস্তবতা ফিরে দেখা প্রাসঙ্গিক।

সত্তরের দশকের শেষ বছরে নভেম্বর মাসের ২৫ তারিখে এক তরুণ ইক্ষু চাষির পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার কার্যকারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ দেখিয়েছিলেন, ইক্ষু চাষিরা ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না, ইক্ষু বিক্রি করতে গিয়ে নানাভাবে হয়রানি ও প্রতারণার শিকার হয়ে ইক্ষু উৎপাদনে নিরুৎসাহ হচ্ছে এবং কারখানায় ইক্ষু বিক্রির বদলে গুড় উৎপাদনকারীর কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে, রাষ্ট্র ইক্ষু চাষিকে প্রণোদনার মাধ্যমে আকৃষ্ট করার বদলে গুড় নিয়ন্ত্রণ আইন, পুলিশি নির্যাতন এবং গুলি চালিয়ে পর্যন্ত ইক্ষু বিক্রি করতে বাধ্য করার চেষ্টা করেছে। (সূত্র : আখ কাহিনী, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৯৮০)। এর পর থেকে গত ৩৫ বছরে আখ চাষিদের সমস্যার সমাধান হয়নি, বরং নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। ২০১৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বজনকথায় প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রের জন্য চিনিশিল্পের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনাগত সংকটের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মোশাহিদা সুলতানা ও কল্লোল মোস্তফা দেখিয়েছিলেন, কৃষকদের অনীহার কারণে আখ চাষ কমে যাওয়া চিনির উৎপাদন তথা উৎপাদনশীলতা বাড়ানো ও উৎপাদন খরচ কমানোর একটি বড় অন্তরায়। সেই গবেষণাপত্রে উঠে এসেছে, চিনিকলের কাছ থেকে আখ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সার/কীটনাশক/বীজ সংগ্রহ করতে হলে কৃষককে প্রায় ১১ শতাংশ সুদ প্রদান করতে হয়। এগুলো সময়মতো পর্যাপ্ত পাওয়া যায় না, বেশি দামে কিনতে হয় এবং অনেক সময় ওজনে কম দেয়া হয় বলে চাষিরা অভিযোগ করে। বিক্রির টাকা আদায় করার জন্য কৃষককে মাসের পর মাস ধরনা দিতে হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চাষির পক্ষে ৩ থেকে ৬ মাস অপেক্ষা করার সুযোগ থাকে না, ফলে তাকে দালালদের কাছে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ লস দিয়ে পাওনার রসিদ বিক্রি করে দিতে হয়। চিনিকলের দৈনিক মাড়াইক্ষমতা নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে কোন চাষির কাছ থেকে কবে আখ কেনা হবে তার একটা পারমিট বা পুঁজি দেয়া হয় চাষিকে। জমিতে ইক্ষু পরিপক্ব হওয়ার পরও সময়মতো পুর্জি পাওয়া যায় না। আবার পুর্জি পাওয়ার পর ক্ষেত থেকে ইক্ষু চিনিকলে বা চিনিকলের ক্রয়কেন্দ্রে পরিবহন করতে গিয়ে সময়মতো ট্রাক বা ট্রাক্টর ভাড়া পাওয়া যায় না। এ ছাড়া ক্রয়কেন্দ্রে চাষিকে আখের ওজন কম দেয়ার অভিযোগও দীর্ঘদিনের। চিনিশিল্প উন্নয়ন যদি সত্যিই লক্ষ্য হতো তাহলে আখ চাষে প্রতিবন্ধকতা দূর না করে, কৃষকদের আখ চাষে প্রণোদনা না দিয়ে, কেন উন্নয়নের নামে নির্বিচারে সাঁওতালদের ওপর গুলি চালানো হলো?

এখন দেখা যাক, যে জমি নিয়ে এত কথা সেই জমি থেকে রংপুর চিনিকলের আয় কত। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে রংপুর চিনিকলের মোট আয় ছিল ১০ কোটি টাকা, এর মধ্যে খামারের আয় ছিল প্রায় ১.৩ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ এর সংশোধিত বাজেটে আয় দেখানো আছে ১০ কোটি টাকা, কিন্তু খামারের আয় কমে দাঁড়িয়েছে ৫০ লাখ টাকা। অর্থাৎ রাষ্ট্র কি তাহলে মাত্র ৫০ লাখ টাকা আয় করার জন্য দিনের পর দিন মানুষকে তাদের জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার নীতি সমর্থন করে যাচ্ছে? এই বিশাল আয়তনের জমি সারা বছর আবাদ করলে কত গুণ বেশি আয় হতে পারে এবং সেই আয় এখন কাদের ঘরে যাচ্ছে তা প্রশ্নের দাবি রাখে।

৪. উপসংহার

রাষ্ট্রের মালিক জনগণ তার নিজ রাষ্ট্রে উদ্বাস্তু হতে পারে না। কিন্তু

বাংলাদেশে আমরা তা-ই দেখছি। যে সাঁওতালদের পূর্বপ্রজন্ম তাদের শ্রম দিয়ে এই দেশের বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে ভূমি আবাদযোগ্য করেছিল, সেই সাঁওতালদের ওপর নৃশংস আক্রমণ করে তাদের ভূমির অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। সেই জনগোষ্ঠী, যারা তীর-ধনুক নিয়ে একাত্তরে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করেছিল এ দেশের স্বাধীনতার জন্য, আজ স্বাধীন দেশের পুলিশ তাদেরই ট্যাক্সের টাকায় কেনা বুলেট দিয়ে খুন করছে তাদের। এর বিরুদ্ধে আজ সাঁওতাল-বাঙালি, সচেতন মানুষ প্রতিবাদ করছে। যত দিন এই রাষ্ট্রের আইন, আদালত, প্রশাসন, পুলিশ, প্রতিরক্ষা, এমপি-মন্ত্রী, গোটা রাষ্ট্র প্রকৃত অর্থে জনগণের স্বার্থে কাজ না করবে, তত দিন এই ভূমিবঞ্চিত সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ তার ন্যায্য অধিকার আদায় করতে পারবে না।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক বিবেচনা করেও সাঁওতাল ও বাঙালিদের ভূমি তাদের ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব। চিনিশিল্পের উন্নয়নে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে এক দিক থেকে যেমন চিনিশিল্পের বিকাশ ঘটানো সম্ভব, তেমনি ভূমি কৃষকের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এবং আখ চাষে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা দিয়ে ভূমির উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেশের আয় বাড়ানো সম্ভব। সরকার যা করতে পারে–১. এই আখ চাষের ফলন বৃদ্ধির দায়িত্ব কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে দিয়ে দিতে পারে। ২. নিয়মিত বীজের সরবরাহ, সার ও বীজ ক্রয়ে প্রণোদনা দিতে পারে। ৩. কৃষকদের সময়মতো পাওনা পরিশোধ নিশ্চিত করতে পারে। ৪. আমরা জানি, ইক্ষু আহরণের পর মিলে যত দেরিতে সরবরাহ করা হয় তত সুক্রোজের পরিমাণ কমতে থাকে এবং বেশি ইক্ষু থেকে কম চিনি উৎপাদন হয়। ইক্ষু সময়মতো আহরণ করে এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা নিতে পারে। ৫. কৃষি মন্ত্রণালয় এমন বীজ সরবরাহ করতে পারে, যাতে প্রতি ১০০ কেজি ইক্ষু থেকে ৬ কেজি চিনি উৎপাদন না করে ১০-১২ কেজি চিনি উৎপাদন করা যায়। ৬. পরিবহনব্যবস্থা এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করা যায়, যাতে ইক্ষু আহরণের পর কৃষকদের মিলে সরবরাহ করতে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে না হয় এবং সুক্রোজের মাত্রা দেরি করার কারণে হ্রাস না পায়। ৭. চিনি উৎপাদনের পর বিতরণব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করতে পারে।

সরকারের যেসব পদক্ষেপ নেয়া জরুরি তার মধ্যে রয়েছে :
৬ নভেম্বর মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত সবাইকে আইনের আওতায় এনে বিচার করা। সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আহতদের চিকিৎসার সার্বিক দায়িত্ব সরকারের বহন করা, সংঘর্ষের ঘটনায় আদিবাসীদের নামে সব মামলা তুলে নেওয়া এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেয়া, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

মোশাহিদা সুলতানা: লেখক, গবেষক ও শিক্ষক,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইল: moshahida@gmail.com
নেসার আহমেদ: লেখক। ইমেইল: ahmeddipock@gmail.com
রাখাল রাহা: লেখক। ইমেইল: sompadona@gmail.com

তথ্যসূত্র:

[বিএসএফআইসি] বিএসএফআইসি বাজেট ২০১৫-১৬ (২০১৫)

[বিএসএফআইসি] বিএসএফআইসি (২০১৪) 'চিনিকলগুলোর আধুনিকায়ন, অপচয়, দুর্নীতি রোধ এবং চিনিকলসমূহে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের সুযোগ সৃষ্টিসহ সারা বছর চালু রাখার পরিকল্পনা', বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, জানুয়ারি ২০১৪

[রংপুর চিনিকল] রংপুর চিনিকল (২০১৪) রংপুর চিনিকলের কার্য সম্পাদনী প্রতিবেদন, মৌসুম ২০১৩-১৪

মেসবাহ কামাল, ঈশানী চক্রবর্তী, জোবাইদা নাসরীন (২০০২) 'নিজভূমে পরবাসী : উত্তরবঙ্গের আদিবাসীর প্রান্তিকতা ডিসকোর্স', প্রকাশক : দিব্যপ্রকাশ, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

[মুহাম্মদ] আনু মুহাম্মদ, আখ কাহিনী, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৯৮০
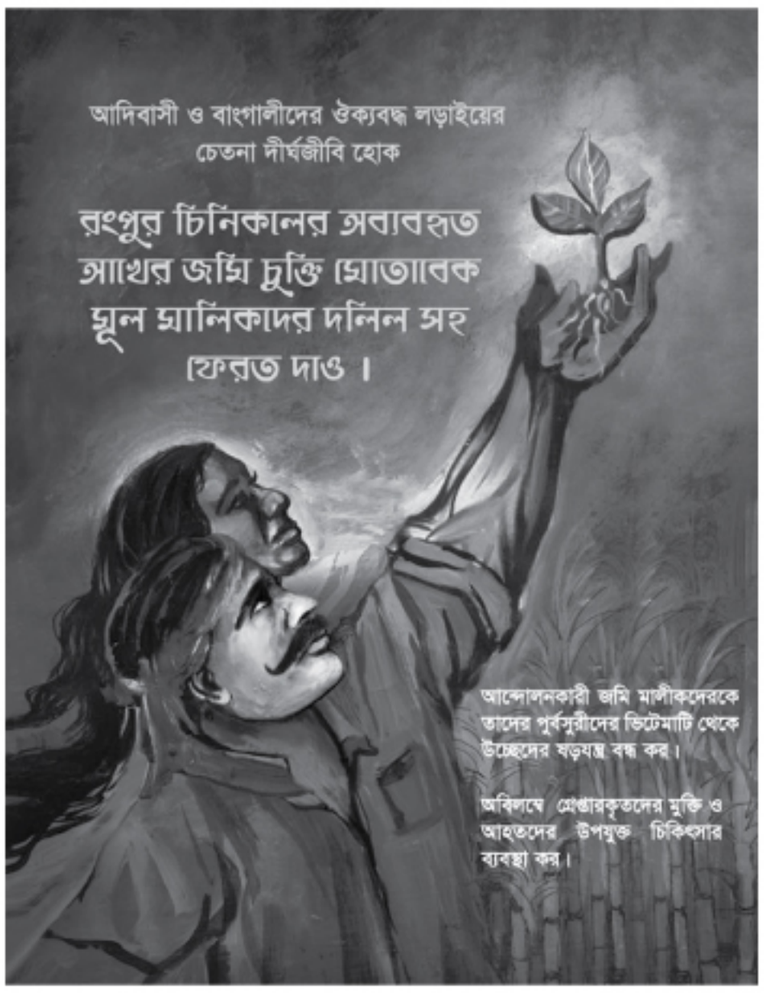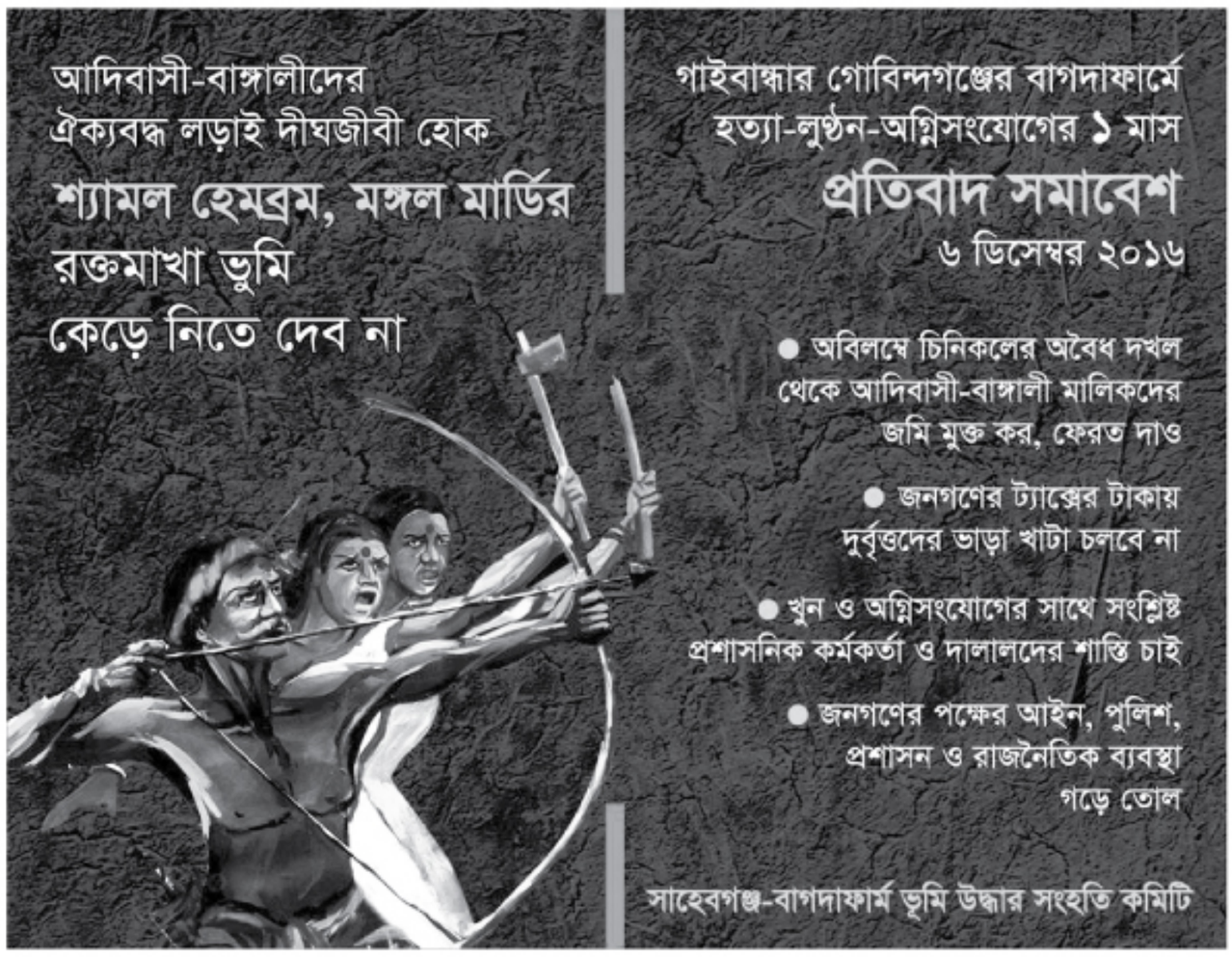
মোশাহিদা সুলতানা ও কল্লোল মোস্তফা (২০১৬) 'রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিশিল্পের সংকট ও সমাধান', সর্বজনকথা, ২য় বর্ষ ২ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬